প্রথম আলো

0 2 DEC 2006

দুই বান্ধবীর গল্প

বিশেষ প্রতিবেদন

আজাদ রহমান, *ঝিনাইদহ*

নাজমা আর লাভলী দুই বান্ধবী। নাজমার জন্ম ১৯৭১ সালে। লাভলীর জন্ম পরের বছর। দুজনই জন্মেছেন ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলায়। দুজন দুই গ্রাম থেকে দুই স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে ১৯৮৩ সালে পড়েন এক স্কুলে, তবে দুজন দুই শ্রেণীতে। তাঁদের বন্ধুত্ব এখান থেকেই শুরু।

এ রকম বন্ধুত্ব অনেকেরই হয়। কিন্তু নাজমা-লাভলীর বেলায় একটু অন্য রকম। তাঁদের বন্ধুত্বের মধ্যে জন্ম নেয় এক অনন্য সাধনা—দুজন একই স্কুলে পড়েন, ক্লাসের অবসরে আড্ডা দেন, গল্প করেন, ভবিষ্যতের কথা ভাবেন। সেই সঙ্গে ভাবেন মেয়ে হয়ে জন্ম নেওয়ার সামাজিক সীমাবদ্ধতার কথাও। আর তখনই তাঁরা মনে মনে ঠিক করে নেন, বড় হয়ে সমাজের জন্য কিছু একটা করতেই হবে।

তাঁরা বড় হন—মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি নেন। তারপর ঢুকে পড়েন মানুষ গড়ার পেশায়—শিক্ষকতায়। দুজন কখনো একই স্কুলে, কখনো পৃথক স্কুলে শিক্ষকতার মাধ্যমে নিজেদের চিন্তা-চেতনার বিকাশ ঘটিয়ে চলেন। একদিন তাঁদের কৃতিত্ব আর সাফল্যের স্বীকৃতিও জোটে—নাজমা দেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের পুরস্কার পান ২০০৫ সালে, লাভলীও দেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের পুরস্কারে ভূষিত হন পরের বছর।

দুই বান্ধবীর সাধনা ও সাফল্যের এই অনন্যসাধারণ কাহিনী নিয়েই আমাদের আজকের বিশেষ প্রতিবেদন:

বন্ধুত্ব ও সাধনা: ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার সুন্দরপুর গ্রামের বাসিন্দা শিক্ষা কর্মকর্তা বাবা মহিউদ্দিন খান ও গৃহিণী মা আশরাফুননেছার ঘরে জন্ম নেন নাজমা খানম। আর লাভলী ইয়াসমিনের জন্ম কালীগঞ্জেরই ফয়লা গ্রামের ব্যবসায়ী বাবা গোলাম রসুল ও গৃহিণী মা রূপবান বেগমের ঘরে।

২০০৫ সালের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক নাজমা খানম ও ২০০৬ সালের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক লাভলী ইয়াসমিন —*প্রথম আলো*

১৯৮৩ সালে নাজমা পড়তেন কালীগঞ্জের সলিমুননেছা বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণীতে। লাভলী সেখানে এসে ভর্তি হন ষষ্ঠ শ্রেণীতে। টিফিনের আড্ডায় পরিচয় হয় দুজনের। অল্প দিনেই তাঁরা হয়ে যান 'প্রাণের বান্ধবী'।

এরপর পৃষ্ঠা ১৭

দুই বান্ধবীর গল্প

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দুজন দুই ক্লাসে পড়লেও স্কুলে যে আগে আসতেন, এসেই খোঁজ করতেন অন্যজনের। দুজনের চেহারায় যেমন মিল, চিন্তা-চেতনায়ও ছিল মিল। সেই সময়ই তাঁরা সিদ্ধান্ত নেন, বড় হয়ে দুজনই শিক্ষক হবেন। এলাকার শিশুদের ভালোভাবে পড়ালেখা শিখিয়ে মানুষের মতো মানুষ হতে সহায়তা করবেন। এ পরিকল্পনা মাথায় নিয়ে নিজেরাও পড়ালেখায় মন দেন।

নাজমা ১৯৮৬ সালে এসএসসি, ১৯৯২ সালে মাস্টার্স ও ২০০৩ সালে বিএড আর লাভলী ১৯৮৮ সালে এসএসসি ও ২০০০ সালে মাস্টার্স পাস করেন।

নাজমা এলেন শিক্ষকতায়: ছোটবেলার সেই স্বপ্নপূরণের চিন্তা মাথায় রেখে মাস্টার্স পাসের পর ১৯৯৩ সালের শেষ দিকে নাজমা যোগ দেন কালীগঞ্জের কুল্লাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক পদে। 'একটা বড় টিনের ঘরে প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস নিচ্ছেন স্যারেরা। একটাই ঘর। বেঞ্চের অভাবে ছেলেমেয়েরা চাপাচাপি করে বসেছে। ভীষণ নোংরা টয়লেট'—এভাবেই প্রথম দিনের শিক্ষকতা ও কর্মস্থলের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলেন নাজমা খানম।

স্কুলের এই দুর্দশা মনে দাগ কাটে তাঁর। যোগদানের কয়েক দিনের মধ্যেই প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলে এলাকার মুরব্বিদের নিয়ে আলাপে বসেন—কীভাবে স্কুলের দুরবস্থা ঘোচানো যায়। তাঁদেরই সহযোগিতায় একদিন স্কুলের টয়লেট ভালো করা হয়। এরপর নাজমা যোগাযোগ করেন জেলা শিক্ষা অফিসে। একসময় স্কুলের জন্য একটি পাকা ভবনও নির্মিত হয়।

নাজমা জানান, খাতাপত্রে ২৫০ জন ছাত্রছাত্রী থাকলেও স্কুলে নিয়মিত আসত ৪০ থেকে ৪৫ জন। কীভাবে এলাকার সব ছেলেমেয়েকে স্কুলে আনা যায়, তা নিয়েও তিনি প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে পরামর্শ করে অভিভাবকদের নিয়ে বৈঠক করেন। সফল হয় তাঁর উদ্যোগ। অনেক ছেলেমেয়ে নিয়মিত স্কুলে আসতে থাকে। পড়ার প্রতি তাঁদের আগ্রহও ফিরে আসে। আগে যেখানে শ্রেণী-পরীক্ষায় পাসের হার ছিল ৫০ থেকে ৫৫ ভাগ, তা বেড়ে দাঁড়ায় ৭০ থেকে ৭৫। একসময় শতভাগও হয়ে যায়। অতীতে কেউ না পেলেও নাজমার আমলে এক ছাত্র বৃত্তিও পায়।

এরই মধ্যে ভালো শিক্ষক হিসেবে নাজমার নাম ছড়িয়ে পড়ে। উপজেলার বারোবাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাইলট প্রকল্প চালু হলে নাজমাকে প্রেষণে নিয়ে যাওয়া হয়। বারোবাজারে এসে নাজমার উদ্যম যেন আরও বেড়ে যায়। বাড়বে না-ই বা কেন? প্রাণের বান্ধবী লাভলী যে এ স্কুলেই শিক্ষকতা করছেন! দুই বান্ধবী সে কি খুশি! সেই স্কুলজীবনের মতো শুরু হয় গল্প-আড্ডা—আগে চলত ক্লাস করার ফাঁকে ফাঁকে, এখন ক্লাস নেওয়ার ফাঁকে ফাঁকে। আড্ডার মধ্যেই চলে স্বপ্নপূরণের সাধনা। এ স্কুলটি লাভলীর চেষ্টায় ইতিমধ্যেই সব দিক দিয়ে একটি ভালো স্কুল হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। তার পরও দুই বান্ধবী মিলে নানা পরিকল্পনা করেন আরও ভালো করার। আর তা দেখে স্কুল পরিচালনা কমিটি নাজমাকে এখানেই রেখে দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু ছয় মাসের মাথায় প্রধান শিক্ষক হিসেবে পদোন্নতি পেয়ে ১৯৯৯ সালের ১৮ ডিসেম্বর নাজমা যোগ দেন তাঁর বর্তমান কর্মস্থল কালীগঞ্জেরই শ্রীরামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে।

নাজমা জানান, যেদিন প্রধান শিক্ষক হিসেবে কাজে যোগ দেন, সেদিন থেকে মনের মধ্যে শুধু একটা ভাবনাই আসতে থাকে—এবার নিজের মতো করে স্কুলটি সাজানো যাবে। প্রথম দিনই জানতে পারেন, পৌর এলাকার মধ্যে অবস্থিত হলেও শিক্ষার মানের দিক দিয়ে তাঁর স্কুলটি তৃতীয় গ্রেডে। এখান থেকে কেউ প্রাথমিক বৃত্তি তো পায়ই না, পাসও করতে পারে না। অভিভাবকেরা ছেলেমেয়েদের সরিয়ে নিচ্ছেন। কমতে কমতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪০ জনে। স্কুলের পরিবেশও খুব খারাপ। খেলার মাঠে জঙ্গল। মুখে কাপড় এঁটেও টয়লেটে যাওয়া যায় না।

এ অবস্থা দেখে নাজমা হাতে নেন কিছু পরিকল্পনা। বাড়ি বাড়ি গিয়ে অভিভাবকদের দাওয়াত দিয়ে এনে কথা দেন, তাঁদের সন্তানদের আর বাইরের স্কুলে যেতে হবে না। এখানেই ভালো শিক্ষা পাবে তারা। এরপর ক্লাসে পড়ানোর পাশাপাশি শিশুদের প্রতি বিশেষ যত্ন নেওয়ার জন্য সহকারী শিক্ষকদের দায়িত্ব ভাগ করে দেন। এভাবে গত সাত বছরে উল্লেখযোগ্য সাফল্য আনতে সক্ষম হন তিনি। যে স্কুলে আগে ছেলেমেয়েরা ঠিকমতো পাসও করতে পারেনি, ২০০৩ সালে সেখান থেকে চারজন অংশ নিয়ে দুজন বৃত্তি পায়। পরের বছর একজন এবং ২০০৫ সালেও একজন বৃত্তি পায়। নাজমা খানম জানান, এ স্কুলে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা

লাভলীও শিক্ষকতায়: ১৯৯৩ সালের ২৭ নভেম্বর একই উপজেলার মথনপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক পদে শিক্ষকজীবন শুরু করেন লাভলী ইয়াসমিন। বান্ধবী নাজমার মতো তিনিও প্রথম দিন ঘাবড়ে গিয়েছিলেন স্কুলের পরিবেশ দেখে। এখানেও খাতাপত্রে দেখানো হয় অনেক ছাত্রছাত্রী, কিন্তু স্কুলে আসে কম। এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পরের মাসেই স্কুলপ্রাঙ্গণে 'মা সমাবেশ' আহ্বান করেন লাভলী। নিজেই বাড়ি বাড়ি গিয়ে অভিভাবকদের দাওয়াত দিয়ে আসেন। সফল হয় মা সমাবেশ। ক্লাসে ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতি বেড়ে যায়। এরপর শুরু হয় পাঠদানের আরও সংগ্রাম এবং অল্প দিনের মধ্যেই আসে সুফল। আগে পরীক্ষায় বেশির ভাগ অকৃতকার্য থাকলেও লাভলীর চেষ্টায় এখন পাসের হার শতভাগ।

এরপর ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বরে লাভলী যোগ দেন বারোবাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। এখানে পড়ালেখার মান কিছুটা ভালো থাকলেও পরিবেশ ছিল নোংরা। যোগ দিয়েই লাভলী শুরু করেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান। বিদ্যালয়ের আঙিনায় গড়ে তোলেন সবজি ও ফুলের বাগান। ছাত্রছাত্রীদের মননশীলতা বিকাশে নিয়মিত আয়োজন করেন সংস্কৃতিচর্চার। এসব দেখে ইউনিসেফ বিভিন্নভাবে বিদ্যালয়টির সহযোগিতায় এগিয়ে আসে, চালু হয় পাইলট প্রকল্প। ১৯৯৯ সালের মাঝামাঝি সময়ে তিনি তাঁর সঙ্গী হিসেবে পেয়ে যান বান্ধবী নাজমাকে। লাভলীর কাজের উৎসাহ যায় বেড়ে। লাভলী যোগদানের পরের বছরই তিনজন ও ১৯৯৯ সালে চারজন ছেলেমেয়ে বৃত্তি পায়। এখন বিদ্যালয়ের সামগ্রিক পরিবেশ দেখে সবাই মুগ্ধ।

নাজমা এখান থেকে চলে যাওয়ার কিছুদিনের মধ্যে লাভলীও প্রধান শিক্ষিকার পদোন্নতি নিয়ে বান্ধবীর প্রথম কর্মস্থল কুল্লাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যোগ দেন। সেখানে গিয়েও তিনি মা সমাবেশ করেন, ছাত্রছাত্রীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে পড়াশোনার খোঁজ নেওয়ার জন্য শিক্ষকদের রুটিন তৈরি করে দেন, এমনকি গ্রামে গ্রামে মাইকিং করে ছাত্রছাত্রী সংগ্রহের মতো কঠিন পরিশ্রম করেন।

২০০৪ সালের ৩০ জুন লাভলী যোগ দেন তাঁর বর্তমান কর্মস্থল কালীগঞ্জ পৌর এলাকার শোয়াইবনগর সরকারি মডেল স্কুলে। লাভলী জানান, এ স্কুলে এখন ৪৭০ জন ছেলেমেয়ে আছে। শিক্ষক-শিক্ষিকা আছেন ১১ জন। এখানকার শিক্ষার মান আগে থেকেই ভালো ছিল। তিনি সহকর্মীদের নিয়ে তৈরি করেন বার্ষিক পরিকল্পনা। নতুন উদ্যমে চলতে থাকে পাঠদান। ফলও পাওয়া যায় অল্প দিনেই। আগে যেখানে তিন-চারজন করে বৃত্তি পেত, লাভলী যোগ দেওয়ার পরের বারই বৃত্তি পায় ১১ জন, এর মধ্যে ট্যালেন্টপুলে ছয়জন।

ছোট-বড় সবার প্রিয়: 'বড় আপার ক্লাস করতে খুব ভালো লাগে। বড় আপা খুব ভালো'—শ্রীরামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী শারমিন সুলতানা অ্যানি প্রধান শিক্ষিকা নাজমা খানম সম্পর্কে এ মন্তব্য করে। লাভলী ইয়াসমিনের শোয়াইবনগর মডেল স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র রাব্বি বলে, 'বড় আপা আমাদের খুব আদর করেন। ঠিকমতো পড়া না করলে আপা আমাদের বাড়িতেও চলে যান।' একই স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র মাহফুজুর রহমানের ভাষায়, 'লাভলী আপার মতো বড় আপা আর হয় না।'

দুই প্রধান শিক্ষকের প্রশংসায় পঞ্চমুখ তাঁদের সহকর্মীরাও। শোয়াইবনগর স্কুলের সহকারী শিক্ষক মোমেনা খাতুন বেলী বলেন, স্কুল ও ছাত্রছাত্রীদের জন্য লাভলী ইয়াসমিন যে পরিশ্রম করেন, তার তুলনা হয় না। তিনি বলেন, এখন স্কুলের সবকিছু চলে নিয়মমতো। কাউকে কিছু বলতে হয় না।

শ্রীরামপুর স্কুলের সহকারী শিক্ষক জগদীশ চন্দ্র জানান, এই স্কুলে ঠিকমতো পড়ালেখাই হতো না। নাজমা আপার কারণে এখন এখানে ভালো পড়ালেখা তো হয়ই, নিয়মিত খেলাধুলা এবং গান-বাজনাও হয়।

শ্রীরামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিচালনা কমিটির সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক বলেন, স্কুলটি যে অবস্থায় চলে গিয়েছিল, তা থেকে ফিরিয়ে এনেছেন নাজমা খানম। আগে প্রায়ই তাঁকে স্কুলে এসে খোঁজখবর রাখতে হতো। আর এখন তাঁর খেয়াল রাখার বিষয় একটাই—নাজমাকে যেন বদলি করে না দেয়!

শোয়াইবনগর স্কুলের পরিচালনা কমিটির সভাপতি পৌর কমিশনার মোশারফ হোসেনও বললেন, লাভলী আপার কারণে এখন ছাত্রছাত্রীদের পদচারণে স্কুল মুখরিত থাকে। অনেক অভিভাবক এখন সন্তানদের নিজে থেকেই এখানে ভর্তি করাচ্ছেন।

অবশেষে পুরস্কারের মালা: প্রাথমিক শিক্ষায় অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে সরকার নাজমা খানমকে ২০০৫ সালের শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত করে। একইভাবে লাভলী ইয়াসমিনও ২০০৬ সালে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে পুরস্কৃত হন।

কালীগঞ্জ উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা তবিবুর রহমান বলেন, নাজমা আর লাভলী আসলেই ভালো শিক্ষক। তাঁদের কাজ সব সময় অন্য রকম। তাই পরপর দুই বছর তাঁরা দুই বান্ধবী